কা ব্য ও না ট্য

কাব্যনাট্য

শান্তনু কায়সার

ঐতিহ্য

কাব্য ও নাট্য : কাব্যনাট্য
শান্তনু কায়সার

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

ঐতিহ্য প্রথম সংস্করণ
পৌষ ১৪৩১
ডিসেম্বর ২০২৪
প্রচ্ছদ
নাওয়াজ মারজান

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

KABYA O NATYA : KABYANATYA (Verse & Play : Verse-play)
by Shantanu Kaisar
Published by Oitijjhya
Date of Publication : December 2024

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2024 Heiress of Author
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

ISBN 978-984-776-==

অগ্রজদ্বয়
জহিরুল হক ও মুজিবুল হক
এবং অনুজ
নেসার আহমেদকে
শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে

কা ব্য ও না ট্য

কাব্যনাট্য

সাধারণ বিবেচনায় কাব্যে লেখা নাটককেই কাব্যনাটক বলা যায়। কাব্যনাটক বা কাব্যনাট্য, ইংরেজিতে Verse Play বা Poetic Drama-র সাধারণ অর্থ তাই। কিন্তু ছন্দে রচিত রচনামাত্রই যেমন কবিতা নয় তেমনি নাটক কাব্যে রচিত হলেই তা কাব্যনাটক হয় না। কাব্য ও নাটক–উভয়ের শর্ত পূরণ এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মস্থ, বাহুল্যবর্জিত ও অপরিহার্য হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে যে শিল্পমাধ্যম তাই কাব্যনাটক বা কাব্যনাট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী বন্ধ্যা নাট্যকলার প্রতিক্রিয়ার ফলে এলিয়ট প্রমুখের মধ্য দিয়ে কাব্যনাটক কথাটির বহুল প্রচার ঘটে। কিন্তু পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাল গ্রিক ও এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকলাই ছিল কাব্যনাটকের। অবশ্য তখন কাব্যনাটক কথাটির আলাদা প্রচলনের প্রয়োজন হয়নি, কারণ কাব্যে নাটক রচনাই ছিল তখনকার সাধারণ রীতি।

কাব্যনাট্য বিষয়ে ধারণা লাভের পূর্বে আমাদের বোঝা দরকার নাটক কী, মাধ্যম হিসেবে এর অপরিহার্যতাই বা কোথায়? আমাদের দেশের অত্যন্ত প্রত্যক্ষ উদাহরণ থেকে বিষয়টিকে বোঝা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তরুণ লেখক বা শিল্পকর্মীর মনোযোগ যে-মাধ্যমটির প্রতি সামগ্রিকভাবে আকৃষ্ট হয় সেটি হচ্ছে নাটক। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের, সীমাবদ্ধ মানুষের সঙ্গে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর যে পরিচয় ঘটেছিল তাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপায়ণ ও ব্যাখ্যা করবার একটি প্রধান সাংস্কৃতিক অস্ত্র ছিল নাটক। এটি হয়ে ওঠে সমষ্টিগত যোগাযোগের শিল্পমাধ্যম। যে-আকাঙ্ক্ষাসমূহ এতদিন সুপ্ত ছিল সে সব তখন বিকশিত হওয়ার ইচ্ছায় জনচিত্তে প্রবল অভিঘাতের সৃষ্টি করে। কিন্তু বিদ্যমান ব্যবস্থা তার লালন ও বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। সমাজের সৃষ্ট এই দ্বন্দ্বকে নাটক ছাড়া অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে চিত্রিত করা সম্ভব ছিল না বলেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তা এতটা জীবন্ত ও শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই দ্বান্দ্বিক জটিলতাকে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবতায় গ্রিক ও এলিজাবেথীয় নাট্যচর্চাও লালন করেছে। এরিস্টটল যে বলেছেন কবি অনুকারক মাত্র তা নাট্যকারদের সম্পর্কেই প্রধানত প্রযোজ্য।

কর্মের ক্ষেত্রে উদ্যোগী মানুষের পরিপার্শ্বে থাকে বৈরী পরিবেশ ও পরিস্থিতি। ঐ সবের সঙ্গে লড়াই করে যে মানুষ অথবা জনগোষ্ঠী তারাই হয়ে ওঠে নাটকের কুশীলব। গ্রিক ত্রয়ী-(ট্রিলজি)সমূহ ও বিভিন্ন নাটকে এরই রূপায়ণ দেখি। ইডিপাস, প্রমিথিউস, আগামেনন প্রভৃতি চরিত্র ও পরিবারকে কেন্দ্র করে যে নাট্যঘটনা দানা বাঁধে তা ঐ জীবন ও পরিপার্শ্বের দ্বন্দ্বকেই প্রকাশ করে। দীর্ঘকাল পরের এলিজাবেথীয় যুগে আবার যে নাট্যকলা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় তার কারণ, জীবনবাদী এই দৃষ্টিভঙ্গি। একদিকে রেনেসাঁ-উত্তর ইংল্যান্ডের আকাঙ্ক্ষাসমূহের উদ্বোধন, অন্যদিকে সে সব রূপায়ণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ। হ্যামলেট ও ক্লডিয়াস, ওথেলো ও ইয়াগো– শেক্সপিয়র-সৃষ্ট চরিত্রচতুষ্টয়ের সাধারণ উদাহরণ থেকেও এটি বোঝা সম্ভব।

পৃথিবীর সব প্রাচীন সাহিত্য মৌখিক ঐতিহ্য ও ধারার মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়। আবার আদিম মানুষের যে প্রধান কর্মোদ্যোগ, খাদ্যসংগ্রহ, তাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে গুহাচিত্র ও শিল্প, নানা নৃত্য ও উৎসব। মৌখিক ঐতিহ্যের ফলে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা নাট্যকলাও স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর নির্ভর করে বিকশিত হয়। এর ফলে ঐ আঙ্গিক ছন্দ-নির্ভর হয়ে ওঠে। শিকারের পরে আদিম মানুষ হত্যাকর্মের পুনরাভিনয় করে। তাতে অনুসৃত যাদুবিদ্যা সংগীত ও নৃত্যের সঙ্গে যে-মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাও রচিত হতো ছন্দ ও কাব্যে। এভাবে হরিণ বা শস্যনৃত্যের প্রবর্তন হয়। টোটেমপূজা থেকে আসে মুখোশের ব্যবহার। গ্রিক বা জাপানি 'নো' নাটকে মুখোশের ব্যবহার এরই অনুকরণজাত। আদিম সমাজের যাদুকর ও ওঝারা যে মন্ত্রের ব্যবহার করতো তাও রচিত হতো ছন্দে।

গ্রিক নাট্যকলায় এর অপরিহার্যতার প্রতিফলন ঘটেছে। কাব্য এখানে অলংকার নয়, বিষয়ের অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে যখন আমরা দেখবো যে মানুষের কৃতি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ প্রারম্ভিক পর্ব থেকে কাব্যে লালিত হয়ে এসেছে। পৃথিবীর সভ্য ও প্রধান জাতিসমূহের প্রথম যুগের সাহিত্য রচিত হয়েছে কাব্যে। গ্রিক, স্ক্যান্ডেনেভীয়, অ্যাংলো-স্যাক্সন, রোমান, ভারতীয়, চীনা, জাপানি, মিশরীয় হলো এর সাধারণ উদাহরণ। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে রচিত সুমেরীয় মহাকাব্য 'গিলগামেশ', 'ইলিয়াড', 'ওডেসি', 'ইনিড', অ্যাংলো-স্যাক্সন 'বিউল্‌ফ', 'রামায়ণ' বা 'মহাভারত'-এ এই প্রাচীনতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থও এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কাব্য জীবনচর্চার প্রারম্ভিক ভাষা। আদিম মানুষের দৈহিক ছন্দ, ঢাক বা সাংকেতিক বার্তা থেকে যে ভাষার জন্ম তা প্রথমে যে ছন্দেই রূপায়িত হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সে জন্যে

কাব্যবহির্ভূত বিষয়ও কাব্যে রচিত হতে থাকে। ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক ও জোতদারদের জন্যে নির্দেশাবলি রচনার জন্যে হেসিয়দ কাব্য বা কাব্যধর্মী কাঠামো ব্যবহারকে উপযুক্ত মনে করেছিলেন। রাজনৈতিক ও পরিষদীয় প্রবচন রচনার ক্ষেত্রে সোলোন এগুলোকে ছন্দোবদ্ধ করার কথা ভেবেছিলেন। ভারতীয় আর্যজাতির তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ক ভাবনা-চিন্তা পদ্যে রচিত হয়েছিল। মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সৃষ্টিতত্ত্বের ভঙ্গি ছিল কাব্যিক। গণিতচর্চায়ও যে ছন্দ ব্যবহৃত হতো তার প্রমাণ নানা ছান্দিক সূত্রের উদ্ভাবন। এখনো নামতা বা আর্যার অস্তিত্ব থেকে গণিতের ছান্দিক কাঠামো অনুধাবন অসম্ভব নয়। দীর্ঘকাল প্রকৃতি, আবহাওয়া, গ্রহ-নক্ষত্র, ফসলবিন্যাস ও প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ থেকে খনা যে ফলিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জন করেন তারই ছন্দোবদ্ধ রূপ তাঁর বচন। মেয়েলি ব্রতকথায় রয়েছে নানা বাস্তববুদ্ধির পরিচয়। ওভিদের প্রণয়কৌশল সম্পর্কিত রচনা, ভার্জিলের কৃষিবিষয়ক কাব্য, তুলসীদাস বা সা'দীর নৈতিক উপদেশ ও পদাবলি অথবা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের আলেকজান্ডার পোপের 'অ্যান এসে অন ক্রিটিসিজম' কাব্যের প্রবীণত্ব ও ক্ষমতাকে প্রমাণ করে। এমনকি যে প্লেটো 'রিপাবলিকে'র দশম গ্রন্থে তাঁর 'আদর্শ রাষ্ট্রে' কবিদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন তিনিও ছিলেন কাব্যানুরাগী। ঐ গ্রন্থেই তিনি হোমারের প্রতি তাঁর আশৈশব অনুরাগ ও শ্রদ্ধার কথা উল্লেখ করেছেন। শেলী 'এ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি'তে প্লেটোকে বলেছেন 'ছদ্মবেশী কবি'।

কাব্যের এই বহুমাত্রিক ক্ষমতা নাটকের পূর্বোল্লিখিত দ্বন্দ্বকে ঘনবদ্ধ ঋজুতা ও সরস পারঙ্গমতার সঙ্গে চিত্রিত করে। তাই শুধু নয়, এই নাট্যআঙ্গিক পরস্পরের জন্যে অপরিহার্যও হয়ে ওঠে। নাটকে দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করতে গিয়ে নাট্যকারকেও অনুসরণ করতে হয় কর্মের। যুদ্ধযাত্রা, ফসলের জমি প্রস্তুতকরণ, নিড়ান, মাড়াই, লাঙ্গল দেয়া, বীজ বোনা প্রভৃতি কাজ আদিম মানুষ ছন্দোবদ্ধ সুরযুক্ত আবৃত্তির মাধ্যমে পরিচালনা করতো। ছাদ পেটানোর শ্রমশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার বা মাঝি তার শ্রম লাঘবের জন্যে যে গান গায় তা হচ্ছে ঐ যৌথ কাব্যকলার সাম্প্রতিক রূপ। কর্ম কীভাবে কাব্যে রূপায়িত হয় তার একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে অ্যাংলো-স্যাক্সন মহাকাব্য 'বিউল্‌ফে'। বিউল্‌ফে'র হাতে মানুষ-খেকো রাক্ষস গ্রান্ডেল নিহত হয়। সেখান থেকে যোদ্ধারা যখন ফিরে আসছে তখন পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্যে রাজার এক যোদ্ধা ছন্দোবদ্ধ গল্প বলতে শুরু করে। তার মাথা ছিলো গল্পের ভাণ্ডার। সদ্য-অর্জিত বিউল্‌ফের বীরত্ব মহিমান্বিত করার জন্যে তার অর্জনকে সে জার্মানিক ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সিগমুণ্ডের কর্মের সঙ্গে তুলনা করে।

মৌখিক কাব্যে কর্ম এভাবে কবিতায় পরিণত হয়। বিউল্‌ফ কাজটি করবার আগে প্রতিজ্ঞা করে যে সে গ্রাণ্ডেলকে হত্যা করবে। তখন এটি ছিল প্রতিজ্ঞা, শব্দ, word, কিন্তু যখন সে কাজটি সম্পন্ন করলো তখন তা হলো কর্ম, deed। আবার এই বিষয়টিই যখন কাব্যে রূপায়িত হয় তখন তা হয়ে গেল 'শব্দ'। কর্ম ও শব্দ এভাবে হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক। কাব্যের এই ধরনটিতে নাট্য-উপাদান বর্তমান। বিষয়টি শুধু গ্রিক বা শেক্সপীরীয় নাট্যকলার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের কাব্যচিন্তাতেও তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ-পূর্ব সাংখ্যদর্শনে শরীর গঠনের বর্ণনা অথবা গাজীর গান বা লাঠিখেলায় পরিবেশনরত গায়কদল বা প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরস্পরের মধ্যে উচ্চারিত কাব্যিক সংলাপ অথবা কথকতায় বর্ণনা ও সংলাপের পারস্পরিক স্থানপরিবর্তন থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কর্ম, এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব, কাব্য-আঙ্গিকে নাটককে কীভাবে সাহায্য করে তা বোঝা যাবে প্লেটোর ধারণাকে এরিস্টটল যেভাবে বাতিল করেছেন তা থেকে। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ যে অনুকরণের দোহাই দিয়ে কবিতাকে অর্থহীন প্রমাণ করতে চেয়েছেন এরিস্টটল তা থেকেই 'কাব্যতত্ত্বে' এর গুরুত্বকে চিহ্নিত করেন। বস্তুর আসল রূপ স্বর্গে আছে–এই যুক্তিতে প্লেটো কবির অনুকরণকে বিবেচনা করেছেন দ্বৈত দূরত্বের বিষয় হিসেবে। এরিস্টটল মনে করেন, বস্তুর প্রথম অনুকরণ অর্থাৎ বস্তু নিজে আমাদের বাস্তব প্রয়োজন মেটায়, আর তার অনুকরণ, অর্থাৎ শিল্পগত রূপ মেটায় নান্দনিক চাহিদা। মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের অনুকরণ এভাবে শিল্পসৃষ্টি করে। আর আদিম ও প্রাথমিক সভ্যতার যে মৌখিক ঐতিহ্য তা সাহিত্যে রূপ পায় ছন্দে। ফলে কৃত্য থেকে সৃষ্ট নাট্য-আঙ্গিক হয়ে ওঠে কাব্যিক। সেজন্যে দেখা যায় মহাকাব্যের বর্ণনামূলক আখ্যানেও থাকে নাট্য সম্ভাবনা ও উপাদান। 'ইলিয়াডে'র গদ্যানুবাদের ভূমিকায় E.V. Rieu বলেছেন: Homer invented drama before the theatre was invented to receive it. এরিস্টটল উল্লেখ করেছেন, ট্র্যাজেডি আসলে মহাকাব্যের বিবর্তিত রূপ। গ্রিক কাব্যবিচারেরই একটি অংশ ছিল নাট্যবিবেচনা। জার্মান ভাষায় তাই নাট্যস্রষ্টাও 'ভিকটর' বা 'কবি।'

প্রাচ্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট রূপ লাভ করে। কথিত আছে, ব্রহ্মা নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদ প্রণয়ন করেন। চতুর্থ বেদ থেকে নানা উপাদান সংগ্রহ করে তিনি এই নতুন বেদ সৃষ্টি করেন এবং তার শিষ্য ভরতমুণিকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেন। ভরতমুণি যীশু খ্রীস্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্বে 'নাট্যশাস্ত্র' রচনা করেন। বেদের অনেক স্তোত্র কথোপকথনের আকারে রচিত। বৈদিক

যুগের পর রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থানে নাটকের উল্লেখ রয়েছে। প্রফেসর কীথ অনুমান করেন, নাট্যকার রামায়ণের প্রতি তাঁর ঋণ প্রকাশ করেছেন। রামায়ণের কুশ ও লব চরিত্র থেকে নাটকের কুশীলব কথাটির সৃষ্টি। কাজ থেকে যে নাটকের জন্ম তা কাব্যকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়। অতএব সংস্কৃত নাটকের প্রাথমিক বিকাশ হয় শ্রুতি-নাটক হিসেবে, যার জন্যে নাট্যক্রিয়ায় কাব্যগুণ অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হতো। সংস্কৃত ভাষায় আলঙ্কারিক ও বৈয়াকরণবৃন্দ এই ভাষার সাহিত্যকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন : দৃশ্য ও শ্রুতি কাব্য।

গ্রিসে ডায়োনেসিস দেবতার শীতকালীন উৎসব, হাস্যরসাত্মক শোভাযাত্রা ও সংগীত থেকে কমেডির ও বসন্তকালীন নৃত্য-গীতের উৎস থেকে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি। বসন্তকালীন নৃত্যগীতের এই রূপকল্পকে বলা হতো ডিথিরাম্ব। এরই বিবর্তিত রূপ ট্র্যাজেডি। ডায়োনেসিস ছিলেন প্রকৃতির ও পল্লীর দেবতা, ক্ষেতের ফসল ও গাছের ফল তাঁরই অবদান। শস্যদেবতা ডায়োনেসিস যেমন নাট্যরূপকল্পের স্রষ্টা তেমনি শস্যদেবতা শিবের উৎসব থেকেই নাটক ও যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। শিব ও ডায়োনেসিস উভয়ে লিঙ্গমূর্তিতে পূজিত হতেন। যদিও সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হয়েছে বর্ণশ্রেষ্ঠ, আত্মকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা, তবু শিবের অনার্য গ্রামীণ রূপ এই নাট্যকলাকে গ্রিক নাট্যকলার মতোই জনকেন্দ্রিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেউ কেউ ঋষিদের ওপর কটাক্ষ করে কটি প্রহসন রচনা করলে ওঁরা অভিশাপ দেন—তোমরা শূদ্র হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরা শূদ্র হয়ে যান এবং নাটকও গণচিত্ততার দিকে অগ্রসর হয়। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে এঁরা শূদ্র হিসেবেই উল্লিখিত। শিবোৎসব যে নাটকের স্রষ্টা তা শিব ঠাকুরের নটরাজ, নটেশ, নটনাথ, মহানট, আদিনট ইত্যাদি নাম থেকেই বোঝা যায়। শিব যদিও আর্য সমাজে আর্য রূপ লাভ করেছেন, তবু লৌকিক উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর অনার্য রূপটিও চলে এসেছে। গম্ভীরা গানে আছে :

বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিল চাষ।
আষাঢ় মাসে শিব ঠাকুর বুনিলেন কার্পাস।

কাব্যনাট্যে কর্মের অনুকরণের সার্থক রূপ দেবার জন্যে কাব্যভাষার বিষয়েও শিল্পের প্রাথমিক তাত্ত্বিকরা যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন। 'কাব্যতত্ত্বে' এরিস্টটল কাব্যভাষায় বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ কতটা ও কেমনভাবে থাকবে

সেইসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যখন কাব্য ছিল ব্যঙ্গরসাত্মক বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল নৃত্যকলার তখন ট্রকেয়িক, ত্রিপদী ছন্দ, ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ট্র্যাজেডিতে সংলাপের জন্যে উদ্ভাবিত হলো আয়াম্বিক। কারণ, এটিই হলো সবচেয়ে বেশি কথ্যরীতি সম্মত। হোরেসের 'কাব্যতত্ত্ব' থেকে জানা যায়, প্রকৃতিগতভাবে মঞ্চাভিনয়ের জন্যে এটি শুধু বিশেষ উপযোগী ছিল না, বাস্তব প্রয়োজনেও তা কাজে লেগেছিল। এ ছন্দে লেখা কাব্যাংশ তার বৈশিষ্ট্যের জন্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর কোলাহলকেও চাপা দিতে সক্ষম হয়েছিল। হোরেস জনৈক যুবককে প্রধান নাট্যরচনার কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর এ দীর্ঘ পত্রে (আর্স পোয়েটিকা) সম্ভবত দ্বাদশ থেকে অষ্টম খ্রিষ্টপূর্বাব্দের নাট্যকলার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ছন্দ বা কাব্য যে বহিরারোপিত কিছু নয় হোরেসের আলোচনায় তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কাব্যনাট্যের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করতে গিয়ে এলিয়ট যেমন কাব্যকে সমগ্র নাট্যক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য ও প্রয়োজনীয় অংশ হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন হোরেসের আলোচনায় তার পূর্বধ্বনি শোনা যায় : 'যে লেখক বলতে পারেন দেশের কাছে, বন্ধুর কাছে তাঁর ঋণ কী, পিতামাতা, ভাই এবং অতিথির প্রতি তাঁর কতটা ভালোবাসা থাকা উচিত, একজন সেনেটরের বা একজন বিচারকের কর্তব্যই বা কী, যুদ্ধে প্রেরিত একজন সেনাপতির ভূমিকাই-বা কী–তিনি নিশ্চয়ই জানেন কী করে তাঁর অঙ্কিত চরিত্রগুলোর প্রত্যেকের মুখে প্রকাশের যথার্থ ভাষা যোগাতে হবে। অনুকরণক্রিয়ায় শিল্পী হিসেবে একজন অভিজ্ঞ কবির উচিত হবে আদর্শের জন্য মানুষের জীবন ও চরিত্রের দিকে বারবার তাকানো এবং তা থেকেই তিনি বিশ্বস্ত ভাষাভঙ্গিটি আবিষ্কার করে নেবেন। মাঝেমাঝে দেখা যায় যে কোনো নাটকে সৌন্দর্য, শক্তি ও কলানৈপুণ্যের অভাব সত্ত্বেও এমন কিছু চমৎকার অংশ রয়েছে যাতে নাটকীয় চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণ ঘটেছে। এই জাতীয় রচনা অর্থশূন্য অগভীর শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কাব্যের চেয়ে শ্রোতাদের বেশি আনন্দ দেয় এবং শ্রোতাদের চিত্তে এর আবেদন অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়।' কাব্যনাটকের আঙ্গিকটি যে চমৎকার কিন্তু বিচ্ছিন্ন কাব্যাংশ নয়, বরং নাট্যক্রিয়ারই অপরিহার্য অংশ শেক্সপীরীয় নাট্যকলায়ও তা প্রমাণিত। অভিনেতাদের উদ্দেশে হ্যামলেট যা বলে তাতে এই অপরিহার্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় : Be not too tame neither, but let your discretion be your tutor. Suit the action to the word, the word to the action, কিন্তু পরে তার বক্তব্য : O, reform it altogether, And let those that play your clowns speak no more than is set down for them.

এই আলোচনায় দেখা গেল, গ্রিক ও এলিজাবেথীয় নাট্যচর্চায় কাব্য-আঙ্গিক যেমন অপরিহার্য ছিল তেমনি এই দুই কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররা এটিকে তাঁদের আঙ্গিকের জন্যে আরো সমৃদ্ধ ও বাহুল্যবর্জিত করে তুলেছিলেন। গ্রিক ও এলিজাবেথীয় উভয় নাট্যকলায়ই প্রধানত প্রচলিত কাহিনি থেকেই বিষয় নির্বাচিত হতো। ফলে দর্শক-শ্রোতার কাছে নাট্যঘটনাটি থাকতো পরিচিত। কিন্তু তাতে নাটক দেখার আগ্রহ কখনোই স্তিমিত বা শিথিল হতো না। কারণ, প্রচলিত ঐ কাহিনির মধ্যেই উন্মোচিত হতো নতুন তাৎপর্য ও বিন্যাস। কাব্যনাটকের আঙ্গিক এ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলো যথাযথ ও শক্তিশালী হাতিয়ার। সে কারণেই এস্কিলাসের আগামেমনন বা প্রমিথিউস অথবা সফোক্লিসের ইডিপাস বা শেক্সপীয়রের নাট্যগুচ্ছের কাহিনি দর্শক-শ্রোতার কাছে পরিচিত হয়েও নতুন তাৎপর্যে উন্মোচিত হতো। ঘটনার অন্তর্নিহিত অভিঘাত, চরিত্রসমূহের অনুন্মোচিত বিকাশসহ ভেতর- সন্ধানী নানা সূক্ষ্ম কাজের জন্যে কাব্যই হচ্ছে যথার্থ মাধ্যম। এই দুই কালের নাট্যকাররা এর সর্বোত্তম বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। ফলে প্রমিথিউসের অনমনীয় দৃঢ়তা, তার ও ইডিপাসের যন্ত্রণাভোগ, আগামেমননের বিপর্যয় শুধু ঘটনার মোটা দাগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, নানা অন্তর্লীন অভিব্যক্তিতেও ভাষা পেয়েছে। তৃতীয় নয়ন বা দ্বিতীয় মানের (Second meaning) যা কাজ তার জন্যে ওই নাট্য-আঙ্গিকটি এই উভয়কালে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল।

এলিজাবেথীয় নাট্যকলা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। মধ্যযুগের শেষাংশে ইংরেজি নাট্যচর্চা বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। এটিকে বলা যায় এলিজাবেথীয় নাট্যচর্চার প্রস্তুতিকাল। গির্জায় মিরাক্যাল ও মিস্ট্রি নাট্যকলার চর্চা হতে থাকে। নাটকে যেমন সংগীতের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত হয় তেমনি রোমান ক্যাথলিক কৃত্য ইস্টার-এর মতো খ্রিষ্টীয় অনুষ্ঠান উদ্যাপনের জন্যে 'মাস' (mass) বিকশিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে সন্তদের জীবন ও কাহিনি নিয়ে নাট্যরচনাই শুধু নয় পৃথিবীর জন্ম থেকে বিচারের দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ ধর্মীয় চক্রের নাট্যক্রিয়াও বিশেষ পরিণতি লাভ করে। কিন্তু নাটক ধর্মীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। অবশ্য নাট্যচর্চায় অভিনেতাদের বিরোধ, স্থানীয় বিবাদে নাট্যদলগুলোর জড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন সময় থিয়েটারগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়। ধর্মীয় সংস্কার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৫৭৯ সালে Gosson নাট্যচর্চার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ উচ্চারণ করেন তাঁর

School of Abuse-এ। পরের বছর এর জবাব দেন ফিলিপ সিডনে। তাঁর জবাবের শিরোনাম An Apologie for Poetrie-ই বলে দেয় নাট্যচর্চার সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক কতটা গভীর ও নিকটবর্তী ছিল।

শেক্সপীরীয় নাট্যযুগ কাব্যনাট্যের এক স্বর্ণ-সময়। এই যুগ তার নাট্যকলার ছন্দ অমিত্রাক্ষরকে শুধু আবিষ্কারই করেনি, তার পূর্ণ বিকাশ ও সদ্ব্যবহারও করে। এটি হচ্ছে 'গর্ভোডাক'-এর আড়ষ্ট ছন্দ থেকে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে শেক্সপীরীয় স্বাচ্ছন্দ্য, ক্ষমতা, বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি অর্জনের কাল। জর্জ পিল প্রমুখ নাট্যকার যে-ছন্দকে শুধু স্বাচ্ছন্দ্য ও বৈচিত্র্যে উন্নীত করেন ক্রিস্টোফার মার্লো তার সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করেন। উষ্ণ আবেগ, তার বিভিন্ন স্তরের যথাযথ ব্যবহার ও রেনেসাঁ-উত্তর আকাঙ্ক্ষাসমূহের ভাষাদানে মার্লো এ ছন্দের পূর্ণ ও সক্ষম ব্যবহারে সমর্থ হন। কিন্তু শেক্সপীয়রের নাট্যক্রিয়াতেই এর সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

এলিজাবেথীয় যুগে যা নাট্যে রূপায়িত হতে পারতো তা মিল্টনের সময়ে তাঁর রচনায় মহাকাব্যে চিত্রিত হয়। গৃহবিবাদ, ধর্মীয় রক্ষণশীলদের বাধার ফলে যুগটি নাট্যবিকাশের বৈরী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ সময়ের নাট্য রচনা ছিল প্রধানত গুরুত্বহীন। ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে নাট্যালয় বন্ধের আদেশের মধ্য দিয়ে নাট্যচর্চা একটা বন্ধ্যা পরিণতি লাভ করে। মিল্টনের 'কোমাস' masque-এ ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে গীতিকবিতার চমৎকার ব্যবহার থাকলেও নাটক হিসেবে এর সার্থকতা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে জীবনের অন্তিম পর্বে 'স্যামসন এগোনিস্টিস' রচনা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই কাব্যনাট্যে তিনি গদ্যের এত কাছাকাছি চলে এসেছেন যে একে 'নিষ্প্রাণ' মনে হয়। 'প্যারাডাইস লস্টে'র ভূমিকায় অন্ত্যমিল বর্জনের জন্যে তিনি যে কঠিন মনোভাব প্রদর্শন করেছেন তা এখানে একটি পরিণতিতে পৌঁছেছে। স্যামসনের জীবনের সঙ্গে কবির আত্মজৈবনিক সাদৃশ্যের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে সময়ের প্রসঙ্গ। ঘৃণিত রাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনটি নিষ্ঠুর হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের ভবিষ্যৎ অবশ্যই সম্ভাবনাময়। এই প্রত্যয়টি ঘোষণার জন্যে তিনি ট্র্যাজেডিকে বেছে নিয়েছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ঐ নাট্যকাঠামোতেই তা প্রকাশের যথার্থ ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল। মিল্টনের ক্ষেত্রে এটি আরো বিশেষভাবে উল্লেখ্য এজন্যে যে তিনি নিজে ছিলেন পিউরিট্যান ও নাট্যমঞ্চবিরোধী। তিনিও যখন কাব্যনাট্যের আঙ্গিকটিতে নিজেকে প্রকাশ করেন তখন তার অপরিহার্যতাই প্রমাণিত হয়।

ড্রাইডেনের সময়েও নাট্যকালটি থাকে বন্ধ্যা। তবে ড্রাইডেন নিজে নাটক রচনা, মূল্যায়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে নাট্যচর্চায় বিশেষ অবদান

রাখেন। তাঁর দীর্ঘ গদ্যরচনা The Essay of Dramatick Poesie-তে কাব্যনাট্যের বিষয় যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। চারটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, তিনি নিজেও ছিলেন তাদের একজন, এই আলোচনা অগ্রসর হয়। আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাটকে ছন্দ বা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের ব্যবহার, ইংরেজি ও ফরাসি নাটক এবং ধ্রুপদী নাটকের ত্রয়ী ঐক্যের কঠোর অনুসরণ ও ইংরেজি নাট্যকারদের এ বিষয়ে অধিকতর স্বাধীনতা গ্রহণের বিষয়ে তুলনামূলক বিবেচনা। সেইসঙ্গে এই আলোচনা প্রথমবারের মতো এলিজাবেথীয় ও শেক্সপীরীয় নাট্যকর্ম মূল্যায়নে ব্রতী হয়। ড্রাইডেন ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে একটি ট্র্যাজেডি All for Love রচনা করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ইংরেজি সাহিত্যে নাট্যচর্চা ছিল খুবই দরিদ্র। অলিভার গোল্ডস্মিথ ও শেরিডানের নাটক গদ্যে রচিত। রোমান্টিক যুগের কবিদের নাট্যরচনাও উল্লেখযোগ্য নয়। ইতালিতে রচিত বায়রনের সবগুলো নাটকই ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে রচিত ট্র্যাজেডি। কিন্তু চরিত্র চিত্রণে সার্থকতার পরিচয় দিতে ও ব্ল্যাঙ্ক ভার্সকে নাট্যক্রিয়ায় উন্নীত করতে তিনি সক্ষম হননি। 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড' ও 'দ্য সেন্সি' শেলীর দুটি কাব্যনাট্য। এখানে গ্রিক ও এলিজাবেথীয় উভয় প্রভাবই লক্ষ্যযোগ্য। তবে 'প্রমিথিউসে' যেখানে তিনি নাট্যঘটনা চিত্রণে কল্পনাকে উদ্দাম করেছেন সেখানে 'সেন্সি'তে শিল্পসংযমের পরিচয় বর্তমান। ভিক্টোরীয় যুগের দুই প্রধান কবি লর্ড টেনিসন ও রবার্ট ব্রাউনিং উভয়েই কাব্যনাটক লিখেছেন। কিন্তু নাট্য রচনায় এঁদের সার্থকতা ছিল সীমাবদ্ধ। তবে নাটকীয় স্বগতকথন, ড্রামাটিক মনোলোগ রচনায় এঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। টেনিসনের 'ইউলেসিস' বা 'টিথোনাস' এবং ব্রাউনিংয়ের প্রচুর ড্রামাটিক মনোলোগ-এ এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউলেসিসের সঙ্গে তাঁর জনগণ এবং পুত্র টেলেমেকাসের দ্বন্দ্ব, টিথোনাসের অর্থহীন জীবনপ্রবাহ ও জীবন-সামগ্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে গ্রহণে অসমর্থতা সীমিত নাট্য-পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। 'ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি, 'আন্দ্রিয়া দেল সার্তো' অথবা 'মাই লাস্ট ডাচেস'-এ ব্রাউনিং খণ্ডিত নাট্যঘটনাকে খুবই পারঙ্গমতার সাথে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাট্যকর্মে তার সার্থক রূপায়ণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অতঃপর গত শতাব্দীর শেষাংশ থেকে এ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত বাস্তবতাবাদ ইংল্যান্ড ও ইংরেজি সাহিত্যের নাট্যকলায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। টি. ডব্লিউ. রবার্টসন তাঁর ব্যঙ্গ ও রসবোধের আড়ালে সিরিয়াস বিষয়ে নাটক লিখতে থাকেন। বিষয়ের গভীরতার সঙ্গে তিনি নাটকে আরেকটি কাজ করেন। সেটি হচ্ছে সংলাপের স্বাভাবিকতা। এভাবে নতুন ধরনের কমেডি

অব ম্যানার্স হিসেবে এর আবির্ভাব হলেও তার মধ্য দিয়েও যাকে বলা হয় ড্রামা অব আইডিয়াস তা বিকশিত হয়। নাটকে ধর্ম, তারুণ্য, বার্ধক্য, শ্রম, পুঁজি বা যৌনতার মতো সমস্যা রূপায়িত হতে থাকে। ইবসেনের প্রভাব এক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর হয়। ১৮৯০ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক ছিল ইংল্যান্ডে বাস্তবতাবাদী নাট্যকলা ও চর্চার তুঙ্গ সময়। এই সময় শ'য়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হেনরী আর্থার জোন্স, স্যার আর্থার পিনেরো, জন গলসওয়ার্দী প্রমুখ নাট্যকার। ১৮৯০-পরবর্তী কালে দূর ও ঐতিহাসিক অতীতের পরিবর্তে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ ইংরেজ জীবন, সাধারণ নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হতে থাকে। প্রথমে অভিজাত শ্রেণির বিষয় নাটকে এলেও দ্রুত তা মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষ ও শ্রমের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে শুরু করে। শ্রেণিসংগ্রামের বিষয়, কিছুটা উন্নাসিকতায় হলেও শ-য়ের এবং অধিকতর আন্তরিকতার সঙ্গে গলসওয়ার্দীর নাটকে রূপায়িত হয়। শ এবং সীঙ অবশ্য শুধু বাস্তবতাবাদকে যথেষ্ট মনে করেননি। এই বাস্তবতা ক্রমশ হয়ে উঠছিল যান্ত্রিক, মননির্ভর ও আলোকচিত্রিক। ফলে তা কল্পনা ও অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করতে ব্যর্থ হয়। এলিয়ট যে বলেছেন প্রকৃত জীবন শিল্পের মৌল উপাদান বটে, কিন্তু শিল্পের প্রধান শর্ত এটি যে সে তাকে পরিবর্তিত করে ভিন্ন বস্তুতে, সমকালীন নাট্যকলা তা করতে সক্ষম হয়নি। ফলে নাটক যে আঙ্গিকে তার বিষয়কে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পারত তখন পর্যন্ত তার যোগ্য আবিষ্কার সম্ভব না হওয়ায় নাট্যকলা একটি বিশেষ বন্ধ্যাত্বে এসে পৌঁছেছিল। বাস্তবতাবাদী নাট্যধারা সম্পর্কে ইয়েটস্-এর অসন্তোষ বিশের দশকে নাট্যদর্শকদেরও সাধারণ অনীহার বিষয়ে পরিণত হয়।

গদ্য নাটকে ধৃত বাস্তবতাবাদ এতটা যান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল যে ঐ আঙ্গিকের পক্ষে সমকালীন নাট্য বাস্তবতাকে ধারণ ও প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। আধুনিককালে কাব্যনাটকের প্রধান প্রবক্তা টি. এস. এলিয়ট ১৯৫০-এ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'কবিতা ও নাটকে' যে দুজন গদ্য নাট্যকার ইবসেন ও চেখফের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাঁরাও সমকালীন নাট্যকলায় সৃষ্ট বন্ধ্যাত্ব থেকে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট কোনো পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি। তাছাড়া ঐ দুই নাট্যকারের গভীরতা ও কাব্যিক বাস্তবতাবোধও ছিল অননুসরণযোগ্য। ফলে তার লালন ও বিকাশও ছিল অসম্ভব। এলিয়ট ঐ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন, নাট্যকারদ্বয় নিজেদের নাট্যরচনায় গদ্যের সীমাবদ্ধতাকে মৌলিকভাবে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিলেন।

সমস্যাটি শুধু ইংল্যান্ড বা ইংরেজি সাহিত্যেরই ছিল না, এটি ছিল সামগ্রিকভাবে নাট্যজগতের। গত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গাদ্যিক বাস্তবতাবাদী নাট্যকলার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে নাট্যকাররা নানাভাবে চেষ্টা করে এসেছেন। চেখফ ও ইবসেনের সঙ্গে স্ট্রিন্ডবার্গ ও মেটারলিঙ্ক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় তাঁদের রচনাবলিকে বিন্যস্ত করেছেন। পিরান্দেল্লো নাটকীয় বাস্তবতার ওপর আঘাত করে এবং দর্শক ও অভিনেতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে ভেঙে দিয়েও তা অতিক্রম করতে চেয়ে জিরাদু ও আনুই পৌরাণিক ও নিজেদের আধা-পৌরাণিক জগৎ সৃষ্টি করে এবং সর্বজনীন ও স্থায়ী তাৎপর্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এর সমাধান করতে চেয়েছেন। ও' নীল চেয়েছেন নাট্যপ্রথার মধ্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে, ব্রেখ্‌টকে আবিষ্কার করতে হয়েছে এপিক থিয়েটার বা বিযুক্তকরণ তত্ত্বের। আর্টুডের নৃশংসতার নাট্যতত্ত্বের ফলিত চর্চার মধ্যে দিয়ে জাঁ জেনে চেয়েছেন ঐ সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যেতে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নাট্যকলায় এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুদূরপ্রসারী ফল, প্রভাব ও তাৎপর্যের সৃষ্টি করলেও ঐ প্রত্যক্ষ সময় যে নাট্য-আঙ্গিকের প্রত্যাশা করছিল তার জন্মদানে সক্ষম হয়নি। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাস্তবতাবাদী গদ্য নাটক তার চূড়ান্ত অবক্ষয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। দুটি ঘটনা থেকে এটি বোঝা সম্ভব। সমকালীন জীবনের গভীরতা ও জটিলতাকে রূপায়ণের পরিবর্তে শ'য়ের নাটক ক্রমশ হয়ে উঠেছিল মনোরঞ্জক ও মস্তিষ্কনির্ভর। ঔপন্যাসিক হেনরী জেম্‌স, যিনি ছিলেন নাট্য-সমালোচক এবং যিনি নাটকের আদলে উপন্যাস লিখেছেন, যাঁর ছিল নাট্যবোধ, তিনিও গদ্যে নাটক লিখে ব্যর্থ হন। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে নাট্যজগতে যে বন্ধ্যাত্ব দানা বাঁধছিল এবং পরবর্তীকালে যা আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল তার বিরুদ্ধ-পূর্ব ও সমকালীন প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম হয় নাট্যআঙ্গিক–কাব্যনাটকের।

তাই দেখা যায়, কাব্যনাটক কথাটির সৃষ্টি আধুনিক যুগে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। টি. এস. এলিয়টের মতো ব্যক্তিপ্রতিভায় তা এক বিশেষ পরিণতি লাভ করলেও এটি ছিল সময়ের সচেতন সৃষ্টি। প্রক্রিয়াটির প্রাথমিক প্রয়াস শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। এই শতাব্দীর প্রায় সব প্রধান কবিই, যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস, বায়রন, টেনিসন, ব্রাউনিং, আর্নল্ড, সুইনবার্ন, এমনকি হপকিন্স কাব্যে নাটক লেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা হয় শেক্সপীরীয় নয় গ্রিক নাট্যকলার অনুকরণে এই প্রয়াস চালিয়েছিলেন, যদিও নাটক হিসেবে সে-সবের সার্থকতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও নাট্যচর্চার স্থবিরতা থেকে উত্তীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে যাঁরা